প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠ্যক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ২০০৭

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ইতিহাস **সাম্মানিক স্তর**

ঃ বিষয় সমিতি ঃ

সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত

অধ্যাপিকা হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক নির্বাণ বসু

অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার

সপ্তম খ পত্র

পর্যায় ৩

	মূল রচনা	**সম্পাদনা**
একক—১	অধ্যাপিকা প্রীতা ভট্টাচার্য	শ্রী চন্দন বসু
একক—২	ঐ	ঐ

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শ্রী দীপককুমার রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস — ৭ (খ)

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় ৩

একক ১ আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ ৭-১৩

একক ২ কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৪-২৩

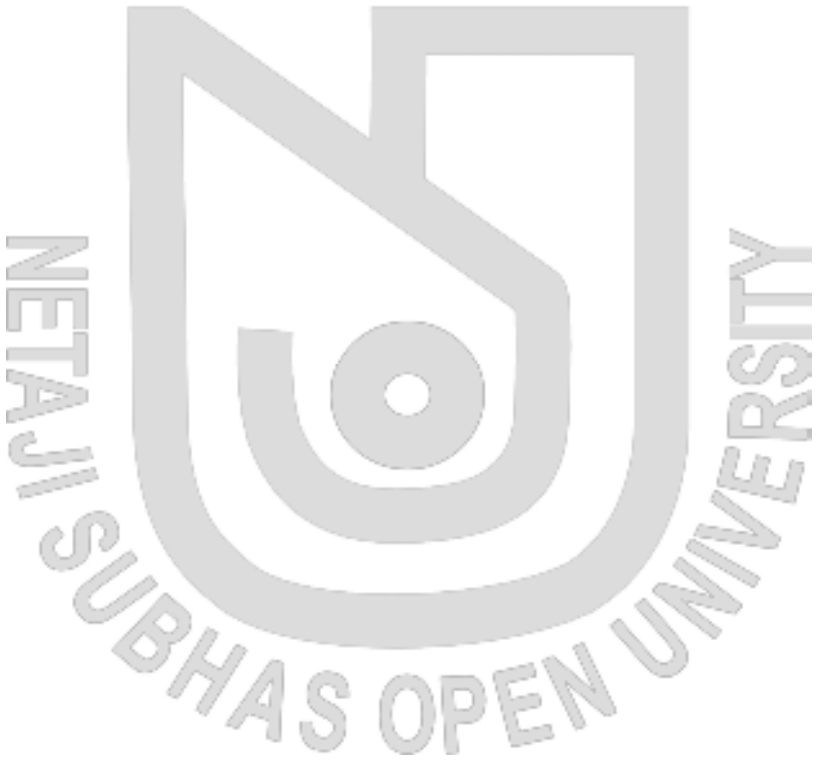
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

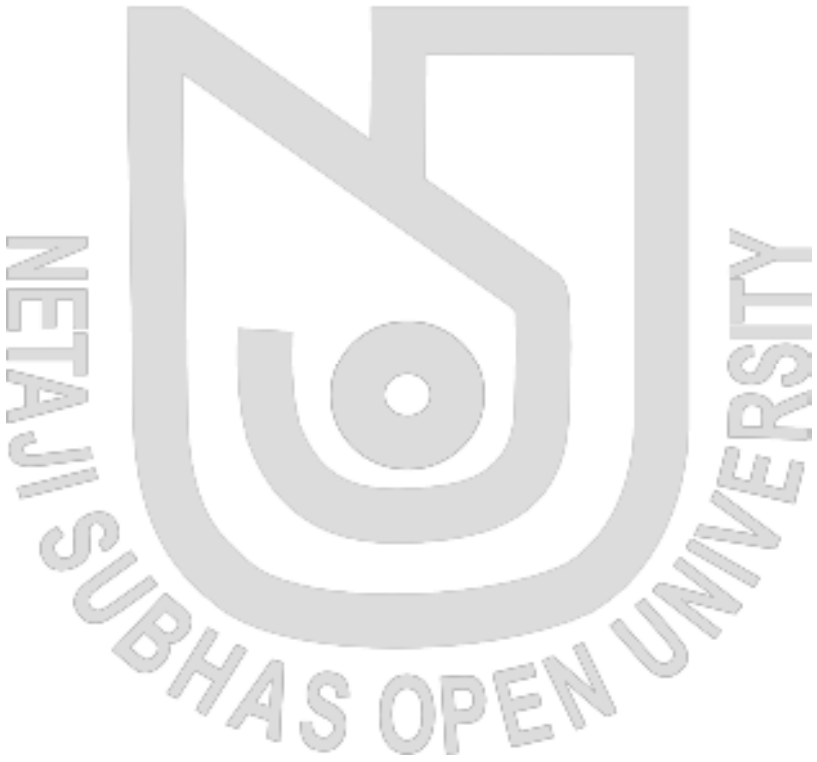
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ১ আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ

গঠন

১.১ ভূমিকা
১.২ আঞ্চলিকতার উন্মেষ
১.৩ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব
১.৪ আঞ্চলিক লিপির উদ্ভব
১.৫ দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক সাহিত্য
১.৬ পূর্ব ভারতে আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব
১.৭ গুজরাটি সাহিত্যের বিকাশে জৈন অবদান
১.৮ উপসংহার
১.৯ অনুশীলনী
১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ ভূমিকা

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী—এই সময়কালের মধ্যে প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি, প্রশাসন, সমাজ এবং জীবনচর্যার আরো বিভিন্ন দিকে কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়। যদিও বলা যেতে পারে, রাষ্ট্র, বর্ণ, জাতি এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবারভিত্তিক যে পুরোনো সামাজিক কাঠামো তাতে কোনো বৈপ্লবিক রদবদল ঘটেনি। তা সত্ত্বেও, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে এবং দক্ষিণ ভারতে পল্লব বা বাতাপির চালুক্যদের নেতৃত্বে যে রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যুত্থান দেখা যায় তা ছিল প্রাক্ গুপ্তযুগের রাষ্ট্রকাঠামোর তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। গুপ্ত যুগে এবং বিশেষত গুপ্ত-পরবর্তী যুগে প্রশাসনিক কর্মচারীদের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান করার যে প্রথা প্রচলিত হয় তাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অবক্ষয় দেখা যায়। তার ফলে দানগ্রাহী ব্যক্তিরা বা কর্মচারীরা কিছু প্রশাসনিক অধিকার এবং কর আদায়ের অধিকার ভোগ করতে শুরু করে। ভূমির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক অধিকার যখন নতুনভাবে বিন্যস্ত হতে থাকে তখনই পৃথক পৃথক রাজনৈতিক এবং রাজস্বসংক্রান্ত এককের উত্থান লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় নতুন শাসকগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে নতুনভাবে ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই নতুন শাসকবর্গ তাদের নিজস্ব অধিকারভুক্ত এলাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

১.২ আঞ্চলিকতার উন্মেষ

অধ্যাপক রামশরণ শর্মার মতে এই ছোট ছোট রাজনৈতিক এককগুলি পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতকের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন কমে আসার ফলে আঞ্চলিকতার ধারণা এই সময়েই আরো পরিপুষ্ট হতে থাকে।

যদিও সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু অঞ্চলের ধারণা নাও স্বীকার করা হয়, তবুও এই সময়ে যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চলাচল হ্রাস পেয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে যখন হূন এবং অন্যান্য বহিরাগত জাতির সঙ্গে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির সংমিশ্রণ সম্ভব হল তখনই 'রাজপুত' নামক এক নতুন সত্তার আবির্ভাব হল এবং রাজস্থান একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হতে পারল।

একইভাবে বাংলা গৌড় এবং বঙ্গ এই দুটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত হল। পরে সম্পূর্ণ এলাকাটিই বঙ্গ নামক একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন দেশীয় ও বিদেশী সাহিত্যে অনেকদিন আগে থেকেই বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' বিভিন্ন আঞ্চলিক সত্তার কথা জানা গেছে যেখানে অধিবাসীদের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রীতিনীতির ক্ষেত্রে অঞ্চল অনুযায়ী বিভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। অষ্টম শতাব্দীর জৈন গ্রন্থ 'কুবলয়মালা' ১৮টি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উল্লেখ করেছে যেখানে ভাষা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৩ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব

সম্ভবতঃ খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে অপভ্রংশের নানাবিধ বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। যার ফলস্বরূপ বাংলা, রাজস্থানী, মৈথিলি, গুজরাটি ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষার আদিরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত বৌদ্ধ বজ্রযান গ্রন্থ থেকে পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানা যায় এবং আদি বাংলা, আদি অসমীয়া, আদি ওড়িয়া এবং আদি মৈথিলি ভাষার বিবর্তনের কথা উপলব্ধি করা যায়। অন্যদিকে, পশ্চিম ভারতে এই পরিবর্তনের কিছু আভাস পাওয়া যায় জৈন প্রাকৃত গ্রন্থগুলি থেকে। মনে করা যেতে পারে যেসব ব্রাহ্মণ দানগ্রাহীরা তাঁদের নিষ্কর ভূমি ভোগ করার উপলক্ষ্যে উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যাত্রা করতেন তাঁরাই প্রচলিত আর্য এবং প্রাগার্য উপভাষাগুলির সঙ্গে সংস্কৃতের বিভিন্ন রূপের সংমিশ্রণ ঘটান এবং তার ফলেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ঘটে।

দাক্ষিণাত্যে আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও প্রসারের প্রমাণও সমান্তরালভাবে লক্ষ্য করা যায়। যদিও রাজদরবারে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতের প্রচলন দেখা যায় তবুও বাতাপিতে সপ্তম শতাব্দীর একটি চালুক্য লেখ-তে কানাড়া ভাষাকে স্থানীয় প্রাকৃত বা স্বাভাবিক ভাষা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের জৈন ধর্মগোষ্ঠীও দেখা যায় পরবর্তীকালে প্রাকৃতের পরিবর্তে তামিলকে তাঁদের প্রধান মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

১.৪ আঞ্চলিক লিপির উদ্ভব

আঞ্চলিক ভাষার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আঞ্চলিক লিপির উদ্ভব ঘটে। গুপ্তযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে লিপির ক্ষেত্রে একধরণের সমসত্ত্বতা লক্ষ্য করা যায়। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে লিপির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক

বিভিন্নতা প্রকট হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক আধিপত্য যেহেতু কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে একই ভাষা এবং একই লিপি আরোপ করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানোর জন্য এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যম হিসাবে স্থানীয় লিপির ব্যবহার হত। ফলে স্থানীয় শিক্ষিত মানুষদের সাহায্যেই প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পন্ন হতে পারত।

১.৫ দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক সাহিত্য

যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং দরবারী সংস্কৃতির আবর্তের মধ্যে সংস্কৃতের কোনো বিকল্প ছিল না পঞ্চম শতকে পল্লব শাসকদের লেখগুলি প্রথমে প্রাকৃত ভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও তামিলের যুগ্ম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশের দুটি উল্লেখযোগ্য নমুনা হল ভারবীর 'কিরাতার্জ্জুনীয়' এবং দণ্ডিণের 'দশকুমারচরিত'। তা সত্ত্বেও নতুন আঞ্চলিক ভাষাকে আশ্রয় করে নতুন ধরণের আঞ্চলিক সাহিত্যের অভ্যুদয়ের কথাও অস্বীকার করা যায় না। এদের মধ্যে সুদূর দক্ষিণে তামিল এবং দাক্ষিণাত্যে কানাড়া সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যায়।

১.৫.১ তামিল ভাষায় আঞ্চলিক সাহিত্য

তামিল ভাষায় কাব্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে। যদিও জৈন সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত উপদেশমূলক কাব্যগুলি হয়তো এই সময়েই প্রচলিত ছিল। তামিল সাহিত্যে মহাকাব্যের ঐতিহ্যও অনেক সময় একইরকম প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। দুটি বিখ্যাত তামিল মহাকাব্য 'শিলপ্পদিকরম' এবং 'মণিমেকলাই', যা তামিল কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র এবং পরিণত কাব্যধারার পরিচয় বহন করে অনেক সময় তাদেরও সময়কাল খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে বলে ধরা হয়।

যদিও এই দুটি কাব্যকে মহাকাব্য বলে অভিহিত করা হয়, তবুও চিরাচরিত সংস্কৃত মহাকাব্যিক কাঠামোর সঙ্গে এদের সাদৃশ্য কম। সমসাময়িক গ্রামীণ জীবন এবং একইসঙ্গে কাবেরীপত্তিনমের নাগরিক প্রাচুর্য সমেত এক দৈনন্দিন জীবনের চিত্র এই দুটি কাব্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

'শিলপ্পদিকরম'-এর লেখক ইলাঙ্গো আদিগল সম্ভবতঃ শ্রমণের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই এই কাব্যে অহিংসা এবং কর্মের ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্মিত জীবনবোধের এক ব্যতিক্রমী বয়ান লক্ষ্য করা গেছে।

তামিল সাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভক্তিবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এঁদের প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তামিলভাষার ব্যবহার এই ভাষাকে উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট করতে থাকে। বিশেষ করে আলওয়ার এবং নায়ানার অর্থাৎ বৈষ্ণব এবং শৈব কবি-প্রচারকদের উদ্যোগে তামিল কাব্যের একটি জনপ্রিয় ভিত্তি নির্মিত হয়। বৈদিক ধর্মাচরণকে পিছনে ফেলে ব্যক্তিগত ভক্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের যে প্রবণতা দেখা যায় এই ধরণের কাব্যে তারই প্রতিফলন ঘটে। বিষ্ণু বা শিবের উদ্দেশ্যে রচিত এই কাব্যগুলিতে ভক্ত এবং ঈশ্বরের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। শৈব কবিদের মধ্যে আপ্পার, সমবন্দর, সুন্দরমূর্তির নাম উল্লেখযোগ্য। আলওয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন নম্মালওযার এবং মহিলা কবি অণ্ডল।

মনে করা যেতে পারে এই প্রচারকদের মধ্যে অনেকেই নিম্নবর্ণের মানুষ এবং তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করে এঁরা এঁদের ভক্তিগীতি প্রচার করতেন। এই সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা যায় খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের শেষভাগে। বলা যেতে পারে, সংস্কৃতায়নের প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভক্তিমূলক কাব্যসাহিত্য একটি ব্যতিক্রমী ধারাকে চিহ্নিত করে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হলেও বৃহত্তর জনজীবনে এর প্রভাব বলিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ।

১.৫.২ পরবর্তী পর্যায়

খ্রিষ্টীয় নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে পল্লব, চোল এবং পরবর্তী চালুক্যদের আধিপত্যাধীন দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত সাহিত্য সাধারণভাবে ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার এবং পুরোনো গ্রন্থের টীকা রচনাকেই গুরুত্ব দেয়। তাছাড়াও পুরোনো ঐতিহ্যের অনুকরণে রাজার চরিত সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয়ও পাওয়া যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল একাদশ শতকে রচিত বিলহনের 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত'।

সমসাময়িক তামিল সাহিত্যে যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু চিরাচরিত উপকরণ ব্যবহৃত হত তাসত্ত্বেও এই সময়ে তামিল সাহিত্যের প্রাণবন্ত এবং বলিষ্ঠ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এর উল্লেখযোগ্য নমুনা হল কম্বনের তামিল রামায়ণ। বাল্মীকি রামায়ণের মূল আখ্যান এবং তার নির্দিষ্ট মতাদর্শগত অবস্থান কম্বনের রামায়ণে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে।

১.৫.৩ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ

তামিল ছাড়াও অন্যান্য দ্রাবিড়ীয় ভাষায় আঞ্চলিক সাহিত্যের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। বিশেষ করে কানাড়া ভাষার উৎপত্তি সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দী বলে অনুমান করা যায়। নবম শতাব্দী থেকে কানাড়া ভাষায় রচিত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং শিক্ষিত জৈন গোষ্ঠীগুলির সংস্পর্শে কানাড়া ভাষার দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। কানাড়া কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'কবিরাজমার্গ' এই সময়ে লিখিত হয়। পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতাব্দীর লিঙ্গায়ত আন্দোলনের বিভিন্ন বচনগুলিও কানাড়া ভাষায় রচিত হয় এবং কানাড়া সাহিত্যের এক নতুন দিক নির্দেশ করে।

অন্ধ্র অঞ্চলে নবম শতাব্দী নাগাদ তেলুগু ভাষার বিকাশ হয়। পরবর্তী দুই শতক ধরে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তেলুগু ভাষায় নতুনভাবে গৃহীত হয়। সংস্কৃতের পাশাপাশি বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে তামিল এবং কানাড়ার মতো তেলুগু ভাষার শব্দভাণ্ডারও সংস্কৃত ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মহাভারত, রামায়ণ এবং কালিদাসের বিভিন্ন গ্রন্থ এই সময় তেলুগু ভাষায় পুনর্লিখিত হয়। যদিও এই সাহিত্যের জনপ্রিয় ভিত্তি ছিল তবুও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই সাহিত্যের বিকাশের পথ সুগম হয়নি।

পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের ব্যবহারিক ভাষা মারাঠি সম্ভবত স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাগুলির থেকে উদ্ভূত এবং সংস্কৃতের সঙ্গে মারাঠির যোগ সেহেতু আরো নিবিড়। যাদব বংশীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও স্থানীয় ভক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় এই সাহিত্যের দ্রুত প্রসার ঘটে। পুরোনো ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন গীতা এইভাবে মারাঠি ভাষায় পুনর্লিখিত হয়। সাধারণভাবে পুরোনো সংস্কৃত গ্রন্থকে আশ্রয় করে বিকাশলাভ করলেও স্থানীয় রুচি অনুযায়ী পরিবর্তন এবং পরিমার্জন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

১.৬ পূর্ব ভারতে আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব

আনুমানিক ৮০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এবং তারও পরবর্তীকালে মগধে প্রচলিত প্রাকৃতভাষা থেকে বিভিন্ন পূর্বভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হয়। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং বিহারের বিভিন্ন ভাষা, যেমন ভোজপুরী বা মৈথিলি প্রাকৃতভাষার বিবর্তনের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৬.১ আদি বাংলাভাষার বিবর্তন

এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই, যে, খ্রিষ্টীয় নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত সংস্কৃতির জগতে সংস্কৃতের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে সংস্কৃত ছাড়াও সে সময়ে প্রাচীন বাংলায় শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং মাগধী অপভ্রংশের একটি বিবর্তিত রূপ প্রচলিত ছিল যা সম্ভবত বাংলা ভাষার একেবারে আদিরূপ।

যদিও এই আদি বাংলাভাষায় লিখিত সাহিত্যের নমুনা খুবই স্বল্প। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে লোকায়ত ভাষার কৌলীন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি সম্ভবতঃ খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে যে প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ উদ্ধার করে আনেন সেই চর্যাগীতির ভাষাতেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীনতম বাংলাভাষার লক্ষণগুলি খুঁজে পান।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত এই ৪৬টি পদ একান্তভাবে বাংলা ব্যাকরণ রীতি ও বাংলা বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহারে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। অধ্যাত্মসাধনার গুহ্য তত্ত্বকে আশ্রয় করে রচিত হলেও এই পদগুলির মধ্যে প্রবাদ, বাক্‌প্রতিমা এবং পারিপার্শ্বিকের যে চিত্র পরিস্ফুট হয় তা বাংলার নিজস্ব সত্তারই প্রতিফলন।

১.৬.২ অন্যান্য পূর্বভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও আদি মধ্যযুগের বিহারের ইতিহাস পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাকৃত অপভ্রংশ এবং অন্যান্য স্থানীয় ভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতির আবির্ভাবের আগে বিহার এবং বিশেষত মিথিলা অঞ্চলের একটি সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিত্র পাওয়ার জন্য আমাদের প্রাকৃত-অপভ্রংশে লিখিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গালম্'এর উপর নির্ভর করতে হয়। পূর্ব ভারতের কোনো অঞ্চলে লিখিত হলেও এর টীকা রচিত হয় মিথিলাতে। শাসকবর্গের প্রশস্তির পাশাপাশি এই গ্রন্থে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার যে চিত্র পাওয়া যায় তার মূল্য অপরিসীম।

এছাড়াও, জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' মৈথিলী ভাষায় রচিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ এবং সমসাময়িক মিথিলা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন ও বর্হিজগতের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেশ করে।

১.৭ গুজরাটি সাহিত্যের বিকাশে জৈন অবদান

আধুনিক সৌরাষ্ট্রে জৈন লেখকেরা যে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করতেন তাতে অপভ্রংশের গভীর ছাপ পড়েছিল। কালক্রমে এই ভাষা বিবর্তিত হয়ে আদি গুজরাটি ভাষার জন্ম হয়। জৈন শ্রমণদের সমর্থন ছাড়াও এই ভাষার যোগ

ছিল জনপ্রিয় রাসলীলা উৎসবের নৃত্যগীতের সঙ্গে। কৃষ্ণ এবং গোপিনীদের লীলাকে উপজীব্য করেই গুজরাটি সাহিত্যের প্রাচীনতম কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল।

১.৮ উপসংহার

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যদিও অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকে কিছু কিছু স্থানীয় ভাষার উদ্ভব ঘটে, তখনও সেগুলির উচ্চমানের সাহিত্যকীর্তির পরিচয় রাখার মতো বিকাশ ঘটেনি। সংস্কৃত ভাষা, দরবারের এবং রাজবৃত্তের গৃহীত ভাষা হিসাবে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকী, প্রাকৃতভাষাও সংস্কৃতের প্রভাবে তার স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছিল। জৈন গ্রন্থগুলি যেগুলি পূর্ববর্তী সময়ে প্রাকৃতেই রচিত হত, এই সময়ে আবার সংস্কৃতকে অবলম্বন করে রচিত হতে থাকে। তবে জায়মান আঞ্চলিক ভাষাগুলির বলিষ্ঠ অগ্রগতির এক পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কেননা, দক্ষিণ ভারতে এবং উত্তর ভারতে সাধারণভাবে রাজবৃত্তের বাইরে এক বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে এগুলির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। লিখিত সংস্কৃতির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কথ্যভাষা থেকে সাহিত্যের ভাষায় এগুলির যে উত্তরণের সম্ভাবনা দেখা যায়, তা নিঃসন্দেহে এই সময়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১.৯ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের একটি বিবরণ দাও।

২। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশে ভক্তিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনগুলির প্রভাব আলোচনা কর।

৩। পূর্ব ভারতে আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রসার কীভাবে ঘটে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। তামিল ভাষায় রচিত মহাকাব্য দুটির নাম কী? এদের উপজীব্য বিষয় কী ছিল?

২। চর্যাপদ বলতে কী বোঝ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কম্বনের নাম বিখ্যাত কেন?

২। তামিল ভাষায় একজন মহিলা কবির নাম কর।

৩। আলওয়ার ও নায়নার কাদের বলা হয়?

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Basham, A. L. (ed) : A Cultural History of India.
Thapar Romila : Early India
Sharma, R.S. : Early Medieval Indian Society
Warder, A. K. : Indian Kavya Literature
Ramesh, K.V. : Jaina Literature in Tamil
রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ২ কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

গঠন

২.১ ভূমিকা
২.২ সৃষ্টিশীল সাহিত্য
২.৩ পরবর্তী সাহিত্য
২.৪ বংশাবলী সাহিত্য
২.৫ চরিত সাহিত্য
২.৬ দর্শনচর্চার বিভিন্ন ধারা
২.৭ বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব
২.৮ আয়ুর্বেদ
২.৯ জ্যোর্তিবিদ্যা ও গণিত
২.১০ পরমাণুতত্ত্বের বিকাশ
২.১১ রসায়ন চর্চার নানাদিক
২.১২ প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি
২.১৩ অনুশীলনী
২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ ভূমিকা

পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিস্তৃত সময়কালের মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারার একটি হল নিঃসন্দেহে পুরোনো সাহিত্যিক কাজগুলির উপর নতুন করে টীকা তৈরি করার প্রক্রিয়া। সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির টীকা রচনা করা হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি ছাড়াও পাণিনির ব্যাকরণ, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র, চিকিৎসাবিদ্যা বা দর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা এই সময়ে রচিত হয়। পালি গ্রন্থের টীকাকে সাধারণভাবে 'অত্থকথা' বলে অভিহিত করা হত এবং প্রাকৃত গ্রন্থের টীকাকে 'ভাষ্য' বা 'নির্যুক্তি' বলা হত। অধ্যাপক রামশরণ শর্মার মতে এই টীকা রচনার প্রবণতা জন্ম নিয়েছিল শ্রেণী এবং বর্ণভিত্তিক সমাজকাঠামোকে নতুনভাবে বৈধতা দান করার জন্যই। যদিও নতুন পরিস্থিতিতে তার পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে সমস্ত আইন-প্রণেতাদের রচনা পাওয়া যায় তাও ভূমি এবং ক্ষমতার অসম বণ্টনকে সমর্থন করে। সুতরাং এদিক দিয়ে সৃষ্টিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে।

২.২ সৃষ্টিশীল সাহিত্য

সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পরিস্থিতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের বহু সাহিত্যকীর্তি পরবর্তীকালে নাট্য, কাব্য বা সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

এমনকী, অনেকে নৃত্য, নাট্য বা কাব্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক গ্রন্থ ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'কেও গুপ্ত পরবর্তী যুগের সৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করেন। এইসব তাত্ত্বিক নির্মাণেই রসতত্ত্বের আলোচনার আভাস লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্য সাধারণভাবে রাজবৃত্ত, উচ্চবর্গীয় নাগরিকশ্রেণীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ছিল। কালিদাসের কাব্যসাহিত্য যার চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় 'মেঘদূতম্' বা 'রঘুবংশম্' কাব্যে এবং নাট্যসাহিত্য যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এই উচ্চমার্গীয় সাহিত্যধারার নিদর্শন। কালিদাস পরবর্তী যুগে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বজায় ছিল ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মাঘের 'শিশুপালবধ' এবং আরো কিছু পরে ভবভূতির 'মালতীমাধব'এ। সাধারণভাবে পরিচিত আখ্যানকে উপজীব্য করে রচিত হলেও এগুলিকে দরবারী সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে পরিবেশনের জন্য তৈরি করা হয়। সাধারণভাবে বিয়োগান্তক রচনা পরিহার করে উপভোগ্য মিলনান্তক আখ্যানকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। ভর্তৃহরি এবং অমরুর কাব্যগ্রন্থে রস বা বিশেষ বিশেষ অনুভূতি এবং আবেগময় পরিস্থিতি উপস্থাপনের কৌশল লক্ষ্যনীয়। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' একটি ব্যতিক্রমী নির্মাণ যা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন স্তরের একটি কৌতূহলজনক চিত্র উপস্থাপিত করে। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে রাজবৃত্তের গোপন সংঘাতময় জীবনের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর অপর নাটক দেবীচন্দ্রগুপ্ত রাজদরবারের নানা ষড়যন্ত্র, গোপন কার্যপ্রণালী দ্বারা নির্মিত আবহকেই উন্মোচিত করে। এছাড়াও, সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' নাটক এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

সপ্তম শতাব্দীতে রাজকীয় পরিমণ্ডলে সংস্কৃত সাহিত্যের মর্যাদার বড়ো প্রমাণ রাজা হর্ষবর্ধনের নিজের নামেই লিখিত তিনটি নাটক—রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা। হর্ষের সমসাময়িক পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন রচিত 'মত্তবিলাস প্রহসন' এই প্রসঙ্গো উল্লেখযোগ্য।

তবে এই সময়কালের মধ্যে বাণভট্টের গদ্যসাহিত্যের খ্যাতিই সর্বাধিক। 'কাদম্বরী' এবং 'হর্ষচরিত' উভয়গ্রন্থই জটিল অলংকারের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

দণ্ডিনের 'দশকুমার চরিত' একটি অভিনব আখ্যানশৈলীর পরিচয় বহন করে। অনেকগুলি আখ্যানকে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে নিছক কল্পনা এবং বাস্তবধর্মিতার সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

সুতরাং বলা যেতে পারে উচ্চমার্গীয় লিখিত সংস্কৃতি উচ্চবর্গীয় নাগরিক পরিমণ্ডলের বয়ানকে পরিপুষ্ট করে। এখানে অধ্যাপক রোমিলা থাপার একটি দ্বিভাষিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন যেখানে প্রাকৃত ম্লেচ্ছভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং রাজদরবারের বাইরে সাধারণতঃ জৈন সংঘগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় নিজের গতিশীলতা বজায় রাখে। এই প্রসঙ্গো বিমল সূরির জৈন রামায়ণ উল্লেখযোগ্য যা পরিচিত বাল্মীকি রামায়ণের আখ্যানকে নানাভাবে অতিক্রম করেছে।

২.৩ পরবর্তী সাহিত্য

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' শাসকের প্রশস্তিমূলক চরিতসাহিত্যের উদ্বোধন ঘটায়। এই আদলেই পরবর্তী চালুক্যদের দরবারে রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের প্রশস্তি করে রচিত হয় বিলহনের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত'।

দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমত' একটি শ্লেষাত্মক নির্মিতি যা নাগরিক জীবনের ছলচাতুরী এবং আরো নানা বিশিষ্ট জীবনচর্যার উপাদানকে চিহ্নিত করে।

এই সময়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধি। এর মধ্যে অপভ্রংশে রচিত চতুর্মুখের 'পদ্মচরিত' ও 'অরিষ্টনেমিচরিত' উল্লেখযোগ্য।

খ্রিষ্টীয় দশম শতকে রাজশেখরের কাব্য এবং নাটকের কথা উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নলের উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে ক্ষেমীশ্বরের 'নৈষধানন্দ'ও এই সময়েরই রচনা।

এই সময়ে চমপূ সাহিত্যের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় এবং ত্রিবিক্রম রচিত 'নল' দ্ব্যর্থবোধক সাহিত্যের একটি প্রকৃষ্ট নমুনা।

একাদশ শতাব্দীতে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর উপন্যাস বা কাব্য লেখার প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে পদ্মগুপ্তের অবন্তীর পরমার রাজার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে।

উপদেশমূলক আখ্যানের সম্ভার হিসাবে পঞ্চতন্ত্রের জন্ম গুপ্ত-পরবর্তী যুগে। একাদশ শতাব্দীতে সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র কাঠামোর মধ্যেই নতুনভাবে বিন্যস্ত করে এমন কিছু আখ্যান যা পুরোনো লোককথার সম্ভারকে একটি সংগঠিত রূপ দিতে পারে।

প্রাকৃত রচনার পুরোনো আদলকে আমরা শেষ প্রত্যক্ষ করতে পারি বাক্‌পতির 'গৌড়বাহ', রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' ইত্যাদি গ্রন্থে।

দ্বাদশ শতকের সবচেয়ে পরিচিত কাব্যগ্রন্থ হর্ষের 'নৈষধচরিত'। নলের আখ্যান ভিত্তি করে রচিত এই গ্রন্থে বিভিন্ন অনুভূতির সম্মেলন ঘটেছে।

তবে গীতিকবিতার ধারা তার জনপ্রিয়তা অটুট রাখে। দ্বাদশ শতকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রাধা কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করতে এক বিশিষ্ট গীতিধর্মিতার পরিচয় দেয়।

২.৪ বংশাবলী সাহিত্য

ঐতিহাসিক তথ্যের আকর হিসাবে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত লেখগুলি ছাড়াও একটি নির্দিষ্ট ধরনের সাহিত্যকেও ধরা হয়। বিভিন্ন শাসকবংশের উৎপত্তি এবং তাদের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায় বংশাবলী সাহিত্যের মাধ্যমে। এই জাতীয় সাহিত্যের যে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। শাসকের অধিকারকে বৈধতা দান করতে, তাঁর উপাধি এবং মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে শাসকের বংশপরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে অতীত ঘটনাবলীকে নথিবদ্ধভাবে সংরক্ষিত করাও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

এই সূত্র ধরেই পুরাণকে ইতিহাসের আধার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর আগে সূতদের মাধ্যমে অতীত সংস্কৃতি যেভাবে উচ্চারিত হচ্ছিল, লিখিত সংস্কৃতির আবর্তের মধ্যে এসে তাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হল। এখানে উল্লেখযোগ্য, পুরাণ সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় লেখা, এবং এগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

এইভাবে, গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগে অতীতের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রচেষ্টা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিষ্ণুপুরাণে যে শাসকদের ধারাবাহিক সিংহাসনারোহণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তি ছিল সমসাময়িক শাসকদের উপযুক্ত বংশপরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে, কিংবদন্তির নায়কের সঙ্গে কোনো ঐতিহাসিক শাসকের বংশানুক্রমিক যোগ খোঁজা হল। সেই সময় নতুন নতুন গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওতায় ঢোকার ফলে তাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ বংশপরিচয় নির্মাণ করা জরুরী হয়ে পড়ল। বিশেষ করে বর্ণভিত্তিক সমাজকে বাঁচাতে হলে শাসকবর্গকে উচ্চবর্ণের পরিচিতি আদায় করতে হল। গুপ্ত পরবর্তী যুগে পুরাণে বংশপরিচিতির বিবরণ হ্রাস পেতে থাকে। তার বদলে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা নিজেরাই নির্মাণ করতে থাকেন তাঁদের বংশপরিচয় যা লেখগুলি ছাড়া পাওয়া যায় শাসকদের বংশচরিতে বা স্থানীয় কোনো রাজ্যের বিবরণীতে।

২.৫ চরিতসাহিত্য

শাসকের প্রশস্তিমূলক জীবনী লেখার সূচনা হয় সম্ভবত বাণভট্টের হর্ষচরিতের মধ্যে। এখানে জ্যেষ্ঠের সিংহাসনে আরোহণ কেন বাধাপ্রাপ্ত হল তার এক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়ে হর্ষবর্ধনের শাসনকালের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিলহনের বিক্রমাঙ্কদেবচরিতেও শিবের আদেশে ছোটভাই সিংহাসন অধিকার করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পালরাজা রামপালের কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করে নিজের রাজকীয় ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসই বর্ণনা করেছে।

কালক্রমে এই চরিত সাহিত্য কিংবদন্তি বা উপকথার যোগসূত্র থেকে কিছুটা সরে এসে কিছুটা বাস্তবসম্মত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিজেদের বংশপরিচয় নির্মাণ করার চেষ্টা করে। সাধারণভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সাহিত্যের সূচনা হয়। যেমন কোনো রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বা রাজধানীর নির্মাণ। এখানে বর্ণিত হতে থাকে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—মন্দির নির্মাণ, বাণিজ্য উদ্যোগ বা নানা রাজকীয় কার্যকলাপ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সংগৃহীত নানা তথ্য। কাশ্মীর রাজবংশ নিয়ে কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' এই আদলে রচিত। একাদশ শতাব্দীতে মালাবারের একটি ক্ষুদ্র রাজবংশের বিবরণী মূষকবংশ-কাব্য বা চাম্বার রাজবংশের ছোট বিবরণী এইভাবে কোনো বংশের প্রশস্তি থেকে একটি আঞ্চলিক বিবরণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

রোমিলা থাপারের মতে, এই জাতীয় সাহিত্যের আসল গুরুত্ব হল মহাজাগতিক বৃত্তাকার সময়ের ধারণার পরিবর্তে ঐতিহাসিক রৈখিক সময়ের ধারণার গুরুত্ব স্বীকার করা। এই সময়ের গতি কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার পারম্পর্য দ্বারা নির্ধারিত, যা মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে। এর প্রধান প্রমাণ, এইসব বিবরণীতে সম্বত বা নির্দিষ্ট অব্দের উল্লেখ। পুরোনো সময় গণনার এককগুলি ছাড়াও নতুন সম্বত প্রতিষ্ঠা করাও শাসকদের প্রতিপত্তির প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

২.৬ দর্শনচর্চার বিভিন্ন ধারা

এই সময়ের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাণবন্ত দার্শনিক বাদানুবাদের উদ্ভব। গুপ্ত-পরবর্তী যুগে বিগত যুগের দার্শনিক ধারাগুলিই নতুনভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে।

এইভাবে ছটি স্বতন্ত্র ধারার কথা জানা যায়। ন্যায়, যা যুক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল, বৈশেষিক-যেখানে জায়মান

পরমাণুতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, সাংখ্য—যা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ধারণাকে গুরুত্ব দেয় না, যোগ—যা শরীরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকে শ্রেয় মনে করে। এছাড়াও, মীমাংসা, যা বেদের ক্ষীয়মান প্রভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে এবং বেদান্ত, যা সমস্ত অব্রাহ্মণ্য জ্ঞানের চর্চাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতেও বৈদিক চিন্তার পুনরুদ্ধার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বৌদ্ধ, জৈন এবং নানা ভক্তিবাদী আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য বৈদিক দর্শনের দুর্বোধ্য এবং সমসাময়িক জীবনে অবান্তর উপাদানগুলিকে পরিহার করে নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে চান শংকরাচার্য। বিশেষ করে উপনিষদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি অদ্বৈতবাদী দর্শনের আলোচনা করেন। একটি মূলসত্তা থেকে বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভূত হয়েছে—এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শংকরাচার্যের সংগঠিত প্রচারকার্য শুরু হয়। মঠ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ও বৌদ্ধ এবং জৈন দার্শনিকদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হন।

বৈদিক সংস্কৃতির বাইরেও দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষাপটে বলিষ্ঠ উপস্থিতি ছিল বৌদ্ধ, জৈন, ভাগবত এবং পাশুপত ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীর। এখানে ব্যক্তিগত ভক্তি এবং ভক্ত ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগই ছিল প্রধান।

পুরোনো ভক্তিবাদী পরিমণ্ডলে শংকরাচার্যের দর্শন কখনো গৃহীত হয়নি। তবে দ্বাদশ শতাব্দীতে শংকরাচার্যের দার্শনিক অবস্থানকে সরাসরি আক্রমণ করে রামানুজের পরিশীলিত এক ভক্তিবাদী বয়ান। শংকরের মতে জ্ঞানই হল জন্ম মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়। রামানুজের মতে জ্ঞানের মতো ভক্তিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, রামানুজ উপনিষদের কিছু চিন্তাপদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং ভক্তিবাদী আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্য দর্শনের মধ্যে একটি যোগ স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতকে মাধবও রামানুজের এই আদর্শ গ্রহণ করেন।

সুতরাং মায়াবাদী নিগূঢ় দর্শনের পাশাপাশি প্রাচীন ছটি দার্শনিক ধারার মধ্যে যে বস্তুনির্ভর চিন্তার প্রমাণ পাওয়া যায় তা উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলেও আদি মধ্যযুগে ভক্তিবাদী চিন্তাপদ্ধতির বিকাশও ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

২.৭ বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব

প্রাচীন ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শিক্ষার প্রক্রিয়া চলত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে। স্মৃতির উপর নির্ভর করে বৈদিক শাস্ত্র ছাড়াও ব্যাকরণ, ছন্দ, যুক্তিবিদ্যা ছিল অধীত বিষয়ের অন্তর্গত। তবে সংস্কৃত শিক্ষার বৃত্তের মধ্যে আরো কিছু বিষয়ে নিয়ে চর্চা চলত জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত বা আয়ুর্বেদের মতো।

২.৮ আয়ুর্বেদ

চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতীয় ঐতিহ্যে 'আয়ুর্বেদ' বা আয়ুবর্ধনের শাস্ত্র হিসাবে অভিহিত হত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত যাদুবিদ্যাকে অতিক্রম করে যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান হিসাবে ভারতীয় আয়ুর্বেদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অধ্যাপক রোমিলা থাপারের মতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যোগ থাকার ফলে আয়ুর্বেদ তার এই যুক্তি ও তথ্যনির্ভর চরিত্র বজায় রাখতে পারে। গুপ্ত ও পরবর্তী যুগে নালন্দা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের

পাঠক্রমে আয়ুর্বেদের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে পশুচিকিৎসাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ হিসাবে প্রাচীন গ্রন্থ চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ সংগ্রহের নাম করা যায়। আরো কিছু টুকরো নথি পাওয়া যায় Bower Manuscript বা ভেল সংহিতা থেকে। এখানে উল্লেখযোগ্য শল্যচিকিৎসার বদলে ওষধি প্রয়োগে রোগের উপশম ঘটানোই চরক সংহিতার লক্ষ্য। শল্যচিকিৎসার অনুশীলন ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে সুশ্রুত সংহিতাতে।

আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে এই পুরোনো গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা করা এবং টীকা রচনার প্রবণতাই দেখা যায়। নতুন তথ্য বা চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ভগভট্ট ও চক্রপাণি দত্ত চরক সংহিতার যে টীকা রচনা করেছিলেন তা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

২.৯ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত

প্রাচীনকালে যাগ্যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সঠিক পরিমাপ-পদ্ধতির প্রয়োজন থেকেই জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের জন্ম, যা জ্যোতিষবেদাঙ্গোর অন্তর্গত। গ্রীক ও রোমের সঙ্গো যোগাযোগের ফলে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তাছাড়াও ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের পরে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। চন্দ্রের গতিবিধির পরিবর্তে গ্রহগুলির গতিবিধির উপর জোর দেওয়ার প্রবণতা বাড়ল। এইভাবে জ্যোতিষবেদাঙ্গোর যুগ থেকে আমরা 'সিদ্ধান্ত' গুলির যুগে উপনীত হই।

পৈতামহ, বশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ এবং সূর্য সিদ্ধান্ত সম্ভবত আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের পূর্ববর্তী যুগেই বর্তমান ছিল। সম্ভবত খ্রিষ্টীয় প্রথম চার শতকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গো গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির যোগাযোগ বাড়ার সঙ্গো সঙ্গো এই সিদ্ধান্তসাহিত্য বিকাশলাভ করে। বিশেষ করে রোমক এবং পৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রীক ও রোমান প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে।

নতুন ধারার জ্যোতির্বিদ্যা প্রথম গভীরভাবে পরিবেশিত হয় আর্যভট্টের গ্রন্থগুলির মাধ্যমে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে আর্যভট্ট নতুন জ্যোতির্বিদ্যার মৌলিক সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা খুঁজতে অগ্রসর হন। সৌর বছরে দৈর্ঘ্যর পরিমাপ এবং পাই-এর মান নির্ণয়ে আর্যভট্টের গণনা আধুনিক গবেষণার কাছাকাছি থাকবে। বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যার আওতা থেকে বেরিয়ে তিনি গ্রহণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। গোলকাকৃতি পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর ভর করে আবর্তিত হচ্ছে এবং তার ছায়া চাঁদের উপর পড়ে গ্রহণের মতো মহাজাগতিক ঘটনা ঘটছে এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আর্যভটিয়ম্। একটি যুক্তিনির্ভর বৃত্তীয় তত্ত্ব (একটি বড়ো বৃত্তের পরিধি বরাবর আবর্তনকারী একটি ছোট বৃত্ত) উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে আর্যভট্টের গ্রন্থগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

আর্যভট্টের প্রায় সমসাময়িক বরাহমিহিরের গ্রন্থগুলিতে জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গো জ্যোতিষবিদ্যার সম্মিলন ঘটে। বরাহমিহির পাঁচটি প্রাচীন সিদ্ধান্তের সারবস্তু পুনরায় নতুনভাবে উপস্থাপিত করেন। বরাহমিহির সম্ভবত গ্রীক ও রোমান জ্যোতির্বিদ্যার বিশিষ্ট ধারাগুলির সঙ্গো পরিচিত ছিলেন। সূর্যসিদ্ধান্তকে তিনি ব্যবহারিক জ্ঞানের আধার হিসাবেই পেশ করেছিলেন।

পরবর্তী জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আর্যভট্টের শিষ্য লাতদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে

ব্রহ্মগুপ্ত এবং প্রথম ভাস্কর, দশম শতকে দ্বিতীয় আর্যভট্ট এবং মঞ্জুল ও দ্বাদশ শতকে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থের রচয়িতা দ্বিতীয় ভাস্করের নাম উল্লেখযোগ্য।

তবে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের তত্ত্বগুলিকে পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্‌রা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। মল্লিকার্জুন সূরী দ্বাদশ শতকেও সূর্যসিদ্ধান্তের টীকা রচনা করেন তেলুগু এবং সংস্কৃত ভাষায়। তাছাড়াও নবম শতকে সূর্যসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লেখা সুমতির 'সুমতি তন্ত্র' গ্রন্থ পরবর্তীকালে নেপালী দিনগণনার পদ্ধতিকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেয়।

ভারতীয় গণিতচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তা কিছু প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে ভিত্তি করে অবরোহী বিশ্লেষণ প্রণালীর পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অনুভবের মাধ্যমে আরোহ প্রণালীকে আশ্রয় করা। ভারতীয় বীজগণিত ছিল গ্রীক বীজগণিতের মতোই প্রাচীন এবং কিছু কিছু দিক দিয়ে বেশি কার্যকরী। একটির বেশি অজ্ঞাত রাশি সম্বলিত সমীকরণ সমাধানে ভারতীয় পদ্ধতির দক্ষতা ছিল এবং জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যামিতির সমস্যার ক্ষেত্রেও বীজগণিতের প্রয়োগ লক্ষণীয় ছিল। একটি কোনো উপপাদ্য বিষয়কে বীজগণিত ও জ্যামিতি উভয় পদ্ধতিতেই প্রমাণ করার চল ছিল।

বীজগণিতের ক্ষেত্রের আর্যভট্টের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর 'আর্যভটিয়ম্'-এ বীজগণিত সংক্রান্ত কিছু শ্লোক পাওয়া যায়। ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' রেখার জ্যামিতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অষ্টম শতাব্দী থেকে আরবদের সঙ্গে ভারতের যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটে তাতে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এরপরে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আরবদের সংযোগ ঘটলে ভারতীয় সংখ্যাসূচক চিহ্ন, দশমিক পদ্ধতি এবং ত্রিকোণমিতির কিছু তত্ত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের পরিচয় ঘটে।

পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য গাণিতিক গ্রন্থগুলির মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে শ্রীধরের 'গণিতসার' ভগ্নাংশ, শূন্যের মান, ঘনক্ষেত্র বা বর্গফল বার করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। দ্বাদশ শতকে দ্বিতীয় ভাস্করের 'লীলাবতী', বা 'বীজগণিত' গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য, বীজগণিত, জ্যামিতি, শূন্য এবং পাই-এর মান নির্মাণে ভারতীয়দের অবদান স্বীকৃত হলেও বীজগণিতের অনির্দিষ্ট মানসম্পন্ন রাশি নির্ধারণে ভারতের অবদান পাশ্চাত্যে গৃহীত হয়েছে পরে।

২.১০ পরমাণুতত্ত্বের বিকাশ

দ্বিতীয় নগরায়ণের পরবর্তী যুগেই নিছক দার্শনিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্ম হয়। পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ কীভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ নিল এবং আদি পদার্থ থেকে কীভাবে বস্তুজগতের উদ্ভব হল তা নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্বগুলি ইহবাদী এবং বস্তুতান্ত্রিক মতাদর্শের ফসল ছিল। বস্তুজগতের উদ্ভব আলোচনা করতে গিয়েই প্রাচীন পরমাণুতত্ত্বের বিকাশ ঘটে।

২.১০.১ ন্যায় বৈশেষিক পরমাণুতত্ত্ব

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকেই কণাদের পরমাণুতত্ত্বের মাধ্যমে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ বা পরমাণুর ধারণা পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে প্রশস্তপদের 'পদার্থধর্ম সংগ্রহ' গ্রন্থে পরমাণু দ্বারা বস্তুজগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

গৌতমের 'ন্যায়সূত্রে' পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। পরে ন্যায়সূত্রের টীকা ন্যায়ভাষ্যতে বাৎস্যায়ন এবং

উদ্যতকর এবং বাচস্পতি পরমাণুতত্ত্বের আরো বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

২.১০.২ আজীবিক পরমাণুতত্ত্ব

আজীবিকদের নিজস্ব কোনো গ্রন্থ যদিও সংরক্ষিত হয়নি, তবুও অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশাম মনে করেন আদিকাল থেকেই ছটি মৌলের ধারণা আজীবিকদের মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থ 'মণিমেকলাই' এবং 'শিলপ্পদিকরম্' থেকে জানা যায়, ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু এবং তার সম্মেলনের ফলে বস্তুজগৎ সৃষ্টির তত্ত্ব আজীবিকরাও বলিষ্ঠভাবে পেশ করেছিলেন।

২.১০.৩ জৈন পরমাণুতত্ত্ব

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকেই জৈন পরমাণুতত্ত্বের মৌলিক বক্তব্যগুলি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। জৈনতত্ত্বে 'পুদগল' বা পদার্থের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। জৈন 'কর্মের' ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েও পরমাণুতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য 'তত্ত্বার্থ সূত্র' এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলির টীকা রচনার মাধ্যমেই জৈন পরমাণুতত্ত্বের বিশদ আলোচনা আমাদের কাছে পৌঁছায়।

২.১০.৪ বৌদ্ধ পরমাণুতত্ত্ব

বৌদ্ধ দার্শনিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেবলমাত্র সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকরা বাহ্যজগতের বাস্তবতা স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁদের গ্রন্থগুলিতেই পরমাণুতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বসুবন্ধুর 'অভিধম্মকোষ' এবং বিভিন্ন সময়ে রচিত তার উপরে নানা টীকা, শুভগুপ্তের সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ 'বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা' থেকে এই তত্ত্বের নানা মৌলিক বক্তব্য পাওয়া যায়। এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল পরমাণুকে এখানে ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে স্বীকার করলেও তার অবিনশ্বরতা স্বীকার করা হয় না।

২.১১ রসায়নচর্চার নানাদিক

সপ্তম-অষ্টম শতকে রসায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র। বাগ্‌ভট্টের 'অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা' সম্ভবত অষ্টম শতকে লেখা— এই গ্রন্থে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নানা খনিজ দ্রব্য এবং প্রাকৃতিক লবণের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। তান্ত্রিক নিগূঢ়তত্ত্বে আলকেমি বা নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার শাস্ত্র ছিল একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান। আলকেমি আয়ুবর্ধক হিসাবে পারদের গুণ স্বীকার করত। নাগার্জুনের 'রসরত্নাকর' এবং শৈব তান্ত্রিক গ্রন্থ 'রসার্ণব' এই অমৃতত্ত্বের আলোচনাতেই ব্যাপৃত ছিল। পরবর্তী যুগে 'রসরত্নসমুচ্চয়' এবং অন্যান্য গ্রন্থে পারদের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধাতুর রাসায়নিক চরিত্র নিয়েও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় আলকেমি তিব্বতেও প্রভাব বিস্তার করে।

২.১২ প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল ধাতুবিদ্যার প্রসার। এক্ষেত্রে মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভ উন্নত ধাতুপ্রযুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। এছাড়া সম্পূর্ণ তাম্রনির্মিত সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্তি এবং সমসাময়িক ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তিগুলি ভারতীয় কারিগরদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা এবং দক্ষতারই পরিচায়ক। ইস্পাত তৈরির কৌশল আয়ত্ত করার ফলে ভারতীয় রণনীতিতেই পরিবর্তন আসে। ভারতীয় ইস্পাত নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র বহির্বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বাইরের বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে।

বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে রঞ্জক পদার্থের ব্যবহারে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। শৈল্পিক পরিবেশনের ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল রংএর ব্যবহার এই নবলব্ধ প্রযুক্তিগত উন্নতিরই ফসল। অজন্তা গুহাচিত্রের মৌলিক রংগুলি আহরিত হয়েছিল বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য থেকে। উজ্জ্বল নীল রংএর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল নীলকান্তমণি।

সাধারণভাবে প্রযুক্তিগত এই উদ্ভাবনগুলি সেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। বরঞ্চ কারিগরদের সংগঠন বা শ্রেণীতে এই প্রযুক্তিগত চর্চা চলত এবং পুরুষানুক্রমিকভাবে নবলব্ধ তথ্যগুলি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত হত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান পরস্পরকে সমৃদ্ধ করতো। রসায়ন এবং গণিত হল এমনই দুটি ক্ষেত্র।

এই সময়ের সংস্কৃত গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য হল তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রয়োগমূলক দিকগুলির উপরেও আলোকপাত করা। সেইভাবে বরাহমিহিরের গ্রন্থে কৃষিবিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বৃষ্টিপাতের হেরফেরের উপর নির্ভর করে শস্যের বৈচিত্র্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে 'মানসার' এবং 'কৃষিপ্রসার' গ্রন্থেও এই ধরণের আলোচনা হয়েছে।

শিল্পশাস্ত্র গ্রন্থগুলিও অষ্টম-নবম শতাব্দী নাগাদ ব্যবহারিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধর্মীয় স্থাপত্যে উৎকর্ষের পাশাপাশি নগরায়ণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও শিল্পশাস্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নগর-পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা বিশদভাবে দেখা গেছে 'মানসার' বা 'শুক্রনীতিসার' গ্রন্থে।

প্রাচীন ভারতে তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে প্রয়োগ হয়েছিল তা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়।

২.১৩ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। প্রাচীন ভারতে বংশাবলী সাহিত্যকে কি ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য সূত্র বলে ধরা যায়? সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বিকাশের ধারা থেকে কীভাবে এর স্বতন্ত্র বিকাশ হয়েছিল?

২। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারাগুলির বিষয়ে আলোচনা কর।

৩। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা কি যুক্তিনির্ভর পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বাণভট্টের হর্ষচরিত যে বিশেষ সাহিত্যধারার উদাহরণ করে— সেটি কী? উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

২। অদ্বৈতবাদী দর্শন বলতে কী বোঝ?

৩। স্থাপত্যশিল্প বিষয়ক তথ্য পাওয়া গেছে কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে?

বিষয়মূখী প্রশ্ন :

১। গীতগোবিন্দ কেন বিখ্যাত?

২। সূর্যসিদ্ধান্ত কী?

৩। রাজতরঙ্গিনী কী?

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

Bhattacharya, Sukumari : Classical Sanskrit Literature
Keith, A. B. : History of Sanskrit Literature
Chattopadhyaya, D. P : A Popular Introduction to Indian Philosophy
Dasgupta, S. N. : History of Indian Philosophy Vols-I-IV
Chattopadhyaya, D. P. : Science and Society in Ancient India
Chattopadhyaya, B. P (ed) : Studies in the History of Science in India Vol-I and II
Hoernle, AFR (ed) : Studies in the Medicine of Ancient India
Filliozat, J : The Classical Doctrine of Hindu Medicine

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY